দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

ডিগ্রী পরীক্ষা

গণফেল এবং নাই কলেজের গল্প

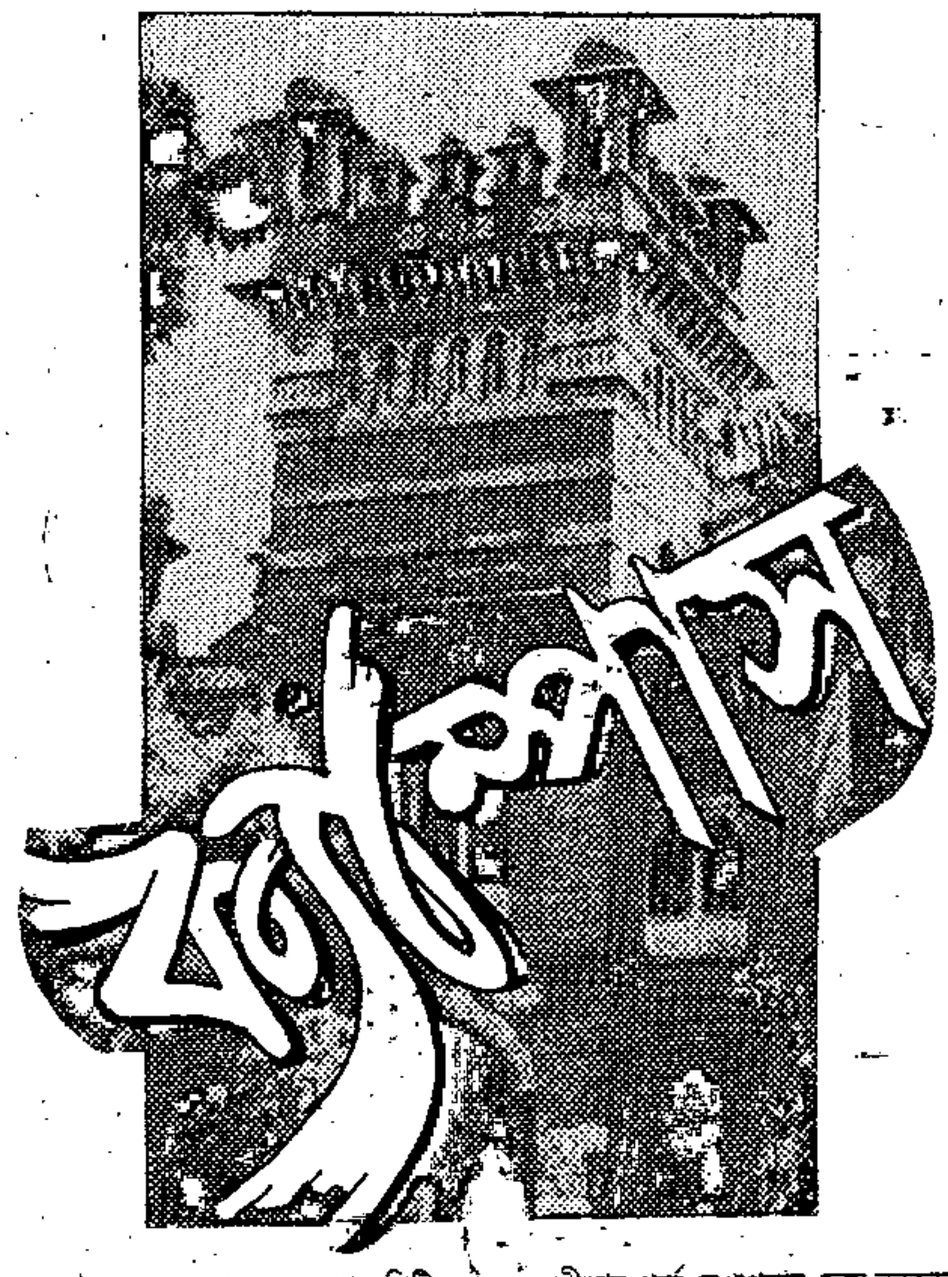

অবশেষে ৫ মাসের মাথায় ফল বেরিয়েছে ডিগ্রী পরীক্ষার। পাসের হার সন্তোষজনক। ৪২.৭৯। অনেককে চমকে দিয়েছে ফলাফল। অবার হতাবাকও করেছে যারপর নাই । দেশের ২শ ৫৮টি কলেজের চরম ফল বিপর্যয় ঘটেছে। ফল বইয়ে ২শ' ৫৮টি ডিগ্রী কলেজের নামের পাশে লেখা হয়েছে নাই, নাই, নাই, প্রথম বিভাগ- নাই, দ্বিতীয় বিভাগ- নাই, তৃতীয় বিভাগও না 'নাই'। পাস করেনি কেউ। এই কলেজগুলো থেকে যারা পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল তারা 'ফেল' করেছে সবাই'। হয় বিএ, বি কম, বিএসএস কিংবা বিএসসি যে কোন একটিতে 'তিন নাই' প্রোথিত হয়েছে কলেজের ললাটে। এর মধ্যে বেসরকারী ভুঁইফোড় কলেজের সাথে এমনসব বিখ্যাত সরকারী কলেজ 'নাই'-এর তালিকায় ঠাঁই নিয়েছে যাতে টাস্কি খেতে হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৯৬ সালের এই ডিগ্রী পরীক্ষায় সারাদেশের ৬শ' ৭৮ টি কলেজ থেকে পরীক্ষার্থীরা অংশ নেয়।

২শ' ৫৮ টি 'নাই' কলেজের মধ্যে বিএ পরীক্ষায় ৮৯টি কলেজ থেকে কেউ পাস করেনি। বিকম পরীক্ষায় ৯৩ টি কলেজ থেকে কেউ পাশ নাই। বিএসএস পরীক্ষার ৫৮টি কলেজ এবং বিএসসি পরীক্ষায় ১৮ টি কলেজের কেউ পাস করেনি।

নিয়মিত শিক্ষার্থীদের চেয়ে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা এবছর ফলাফলে চমক দেখিয়েছে। বিএ পরীক্ষায় মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরাই। ফলাফলে দেখা গেছে- রাজধানীতে সরকারী কলেজগুলোর তুলনায় বেসরকারী কলেজগুলোর ফল বেশ ভালো। আর মহিলা কলেজগুলোও বরাবরের মত ভালো করেছে।

ইতিপূর্বে এত বেশীসংখ্যক কলেজ 'নাই'-এর তালিকায় আসেনি। গত বছর শতাধিক কলেজ 'নাই' তালিকায় ছিল। গত বছর কলেজগুলোর ফল বিপর্যয়ের পর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলঃ কলেজ 'নাই' তালিকায় গেলে অনুদান সংকোচন নীতি গ্রহণ করা হবে। কিন্তু তা কার্যকর করতে পারেনি সরকার।

এবছর ২শ' ৫৮ টি কলেজের ফল বিপর্যয় আমাদের উচ্চশিক্ষার নজীরবিহিন বেহাল দশাকে আরেকবার স্পষ্ট করেছে। এমনিতেই উচ্চশিক্ষা স্তরে শিক্ষার মান নিয়ে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার শেষ নেই। তারপর এই ফল বিপর্যয়। সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞমহল মনে করেন- 'নাই' তালিকার কলেজগুলোর এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি হওয়া উচিত। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে অন্যথায় আগামীতে 'নাই' কলেজের তালিকা দীর্ঘতর হবে। কারণ 'নাই' তালিকার স্থানলাভ (!) করেও এই কলেজগুলোর মধ্যে কোন রকম ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না। তারা ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার দিকে মনযোগ দেয় না। দেখা গেছে ভর্তির মৌসুম এলেই কলেজগুলোতে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ভর্তির আয়োজন চলে। কোন্ কলেজ কত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে পারে তার প্রতিযোগিতা। বেসরকারী কলেজগুলো এদিক দিয়ে প্রতিযোগিতার শীর্ষে থাকলেও সরকারী কলেজে ভর্তির ডামাডোল কম। বেসরকারী কলেজ যত বেশী ছাত্র ভর্তি করতে পারে তাদের অর্থায়নও বেশী হয়। ক্লাস শুরুর পর এ কলেজগুলোতে অন্য এক পর্বের মুখোমুখী হয় ছাত্র- ছাত্রীরা। শিক্ষকরা ক্লাসে পাঠদানের চেয়ে বাসা-বাড়ীতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়াতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ক্লাসে যেনতেন করে একঘন্টা পার করে প্রাইভেট পড়ার মাজেজা সম্পর্কে বয়ান করেন।

বিবিধ প্রলোভনের মায়ায় ছাত্র-ছাত্রীরাও কখনো একক আবার কখনো ব্যাচ করে শিক্ষক মশাইয়ের কাছে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পাঠ গ্রহণ শুরু করে। সারাবছর এভাবেই চলে। মফস্বলের অধিকাংশ বেসরকারী কলেজে ক্লাসের চেয়ে আড্ডাই বেশী হয়। ক্লাস হয় শিক্ষকের বাসায়। ছাত্র-ছাত্রীরা আড্ডার টানেই যায় কলেজ ক্যাম্পাসে।

আর এই ডিগ্রী কলেজগুলোর বিরুদ্ধে গুরুতর যে অভিযোগ তা হলো- শিক্ষকদের জ্ঞানের বহর নিয়ে। ডিগ্রী ক্লাসের পাঠদানের মত যোগ্য শিক্ষক কলেজগুলোতে নিতান্তই কম। মফস্বলের বেসরকারী কলেজগুলোর এ দশা সঙ্গীন। ভুঁইফোড় কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের মাপকাঠিই এখন অর্থ। যোগ্যতা একটি গৌণ বিষয়। অর্থই মুখ্য যোগ্যতা। কোনরকম একটি অনার্স মাষ্টার্স পাসের সার্টিফিকেট আর টাকা থাকলেই যে কেউ কলেজের শিক্ষকগুরু বনে যেতে পারেন। এক্ষেত্রে অনেকসময় সরকারী নিয়োগবিধির যোগ্যতা শিথিল করা হয় অর্থের বিনিময়ে। ডিগ্রী পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ আর মাষ্টার্সে তৃতীয় বিভাগের সার্টিফিকেটধারীও কলেজ শিক্ষক হতে পারেন। ক্লাস নেন ডিগ্রী ক্লাসের ছাত্র- ছাত্রীদের। তৃতীয় বিভাগ পাওয়া শিক্ষকের ছাত্ররা কতটুকুই বা শিক্ষালাভ করতে পারেন তা কৌতুকপ্রদ। গুরুর চরণ ধরে আর কতটুকুই বা অগ্রসর হতে পারে। বেসরকারী কলেজের কর্তৃপক্ষও এসব ব্যাপারে খুব একটা মাথা ঘামান না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের চিন্তা-চৈতন্য অর্থায়নে। কিভাবে কলেজে দু'টি পয়সা বেশী আসবে। ইমারত ভবনগুলো আরো একটু কিভাবে বাড়ানো যায়। কলেজে কিভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র করা যায়। দশ গ্রামের লোক কলেজের চাকচিক্যে কতটা মুগ্ধ হলো তার সমীকরণ এসব। কলেজের শিক্ষার মান কোথায় নামছে তা নিয়ে এদের মাথাব্যথা কম। কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে কেউ পাস করতে পারেনি এ বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। আর সরকারী ডিগ্রী কলেজগুলোর হাল তথৈবচ। সবকিছু দায়সারা গোছের। তাদের ভাবখানা এমন, কলেজের শিক্ষার মান কোথায় নামছে তা দেখবে সরকার। আমাদের কি! সরকারী চাকুরী করছি। প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার। মাসশেষে মাইনে পেলেই তথাস্থ।

মফস্বল এলাকার অধিকাংশ সরকারী কলেজের শিক্ষকরা কিভাবে বড় শহরের কলেজে বদলী হবেন তা নিয়ে লবিং-তদ্বিরে ব্যস্ত থাকেন। উপায়ন্তরনা থাকলে তারাও প্রাইভেট শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করেন। দেখা যায়, একজন শিক্ষক ক্লাসের বাইরে প্রাইভেট টিউশনী, ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্য অনেক কাজে এতই ব্যস্ত থাকেন যে, কলেজের ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদের ভালোভাবে পড়ানোর এনার্জি পান না। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যগ্রহেও অনুপ্রাণিত করতে পারেন না। ছাত্র- ছাত্রীরা নকলের নেশায় ভুগতে থাকে। পরীক্ষার পূর্বে লেখাপড়ার চেয়ে নকলের 'টেকনিক' নিয়ে তাদের সময় যায় বেশী। পরীক্ষায় ভালো করার জন্য যে গাইড দরকার তা ছাত্র-ছাত্রীরা পায় না। ফলাফল– ফল বিপর্যয়। গণফেল। কলেজের নামের পাসে কেবল 'নাই'। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষায় আঁধার আরো নিকট হবে। গত বছর শতাধিক কলেজে যে ফল বিপর্যয় হয়েছিল তা রোধকল্পে কোন কার্যকর ব্যবস্থা হয়নি। এটিকে সাধারণ একটি ঘটনার মত ধরে নেয়া হয়েছিল। ফলে 'নাই'-এর তা[illegible] হয়ে এবছর ২শ ৫৮ টি কলেজে ঠাঁই নিয়েছে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে আগামীতে এই বিপর্যয় যে[illegible] আনবে তা বলা যায় নির্দ্বিধায়। ❑ আনোয়ার আলদীন